প্রথম অধ্যায়

রাঢ়ের ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

রাঢ়ের ভৌগোলিক,
ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক পরিচয়

পূর্ব ভারতের একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল 'রাঢ়' নামে পরিচিত। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেই 'রাঢ়' অঞ্চলের অবস্থান। প্রাচীনকাল থেকে নানাকারণে এই রাঢ় অঞ্চলটির যেমন সীমানা পরিবর্তন হয়েছে তেমনি এই অঞ্চলটি বিভিন্ন সময়ে নানা শাসন ব্যবস্থার অধীনে ছিল। এই প্রাচীন রাঢ়ভূমির ভৌগোলিক পরিমণ্ডলের ইতিহাস, সাহিত্য ও সংস্কৃতির সাথে রাঢ় জনপদের সমাজজীবনের পরিচয় জড়িয়ে রয়েছে। প্রাকৃত ভাষায় রাল বা লাল শব্দের সংস্কৃত রূপ হল 'রাঢ়'। এই 'রাঢ়' শব্দটি মূলত অস্টো-এশিয়াটিক কোল ভাষাভাষী গোষ্ঠীর ব্যবহৃত দেশনাম। সাঁওতাল, হো, ওরাওঁ, লোহার, মালপাহাড়িয়া, কেওট, ভূমিজ প্রভৃতি উপজাতিগুলি এই কোল গোষ্ঠীর বংশধর।[১] কোল ভাষায় 'রৌড়' শব্দের অর্থ পাথর বা পাথরের নুড়ি। অর্থাৎ রাঢ়দেশ রূঢ় রুক্ষ মাটির দেশ। পাথরের ন্যায় শক্ত বা কর্কশ ভূ-ভাগের বিস্তীর্ণ এলাকায় রাঢ়জনপদ গড়ে উঠেছিল।

রাঢ়ের ভৌগোলিক পরিচয়

যে কোনো দেশ বা অঞ্চলের মানবগোষ্ঠীর ইতিহাস ও সংস্কৃতির সাথে ভৌগোলিক পরিবেশের বিশেষ গুরুত্বসহ সম্পর্ক রয়েছে। রাঢ়ভূমির জনপদের ইতিহাসের তুলনায় এর ভূ-তত্ত্বের ইতিহাস অতি প্রাচীন। রাঢ় অঞ্চলে অবস্থিত শুশুনিয়া, বিহারীনাথ, হালদা ও অন্যান্য অনুচ্চ ক্ষয়জাত পাহাড়গুলি পশ্চিমভারতে অবস্থিত আরাবল্লী, বিন্ধ্য পর্বতের ন্যায় গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সমগোত্রীয়। পলির আবরণে আচ্ছাদিত বলে এই অঞ্চল প্রাচীনতার স্বাক্ষর বহন করে। প্রায় ১০ বা ১২ কোটি বৎসর পূর্বে রাঢ় অঞ্চল টেথিস সাগরে নিমজ্জিত ছিল। ভূ-সঞ্চালনের ফলে হিমালয়ের উত্থানে ভূ-ভাগের বৃহৎ অঞ্চলে ভূমিরূপের বিরাট পরিবর্তন দেখা দেয়। তাপের প্রভাবে আবহাওয়ার পরিবর্তনে তুষার যুগ শুরু হয়। পৃথিবীর উপরিভাগ শীতলতার কারণে হিমবাহ গলা জল হিমালয় থেকে প্রবাহিত হয়। ফলে, দীর্ঘস্থায়ী প্লাবন দেখা দেয়। প্লাবন জনিত জলধারার সঙ্গে পাথর, নুড়ি ও পলির অবক্ষেপণের ফলে রাঢ়ভূমির পরিমন্ডল গড়ে ওঠে।

পশ্চিমবঙ্গের রাঢ় সমভূমি অঞ্চলটি পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঢালু। পশ্চিমে মালভূমি অঞ্চল ও পূর্বে ভাগীরথী, হুগলী নদীর মধ্যবর্তী স্থানে যে বিস্তীর্ণ সমতলভূমি দেখা যায় তা রাঢ় অঞ্চল নামে পরিচিত। ঢেউ খেলানো বন্ধুর ভূমি ও টিলা এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিচয় বহন করে। মাটিক স্তর এখানে অগভীর। জল ধারণ ক্ষমতাও কম। নদী অববাহিকা ছাড়া অন্যত্র মাটির উর্বরতা শক্তি যথেষ্ট কম। এই

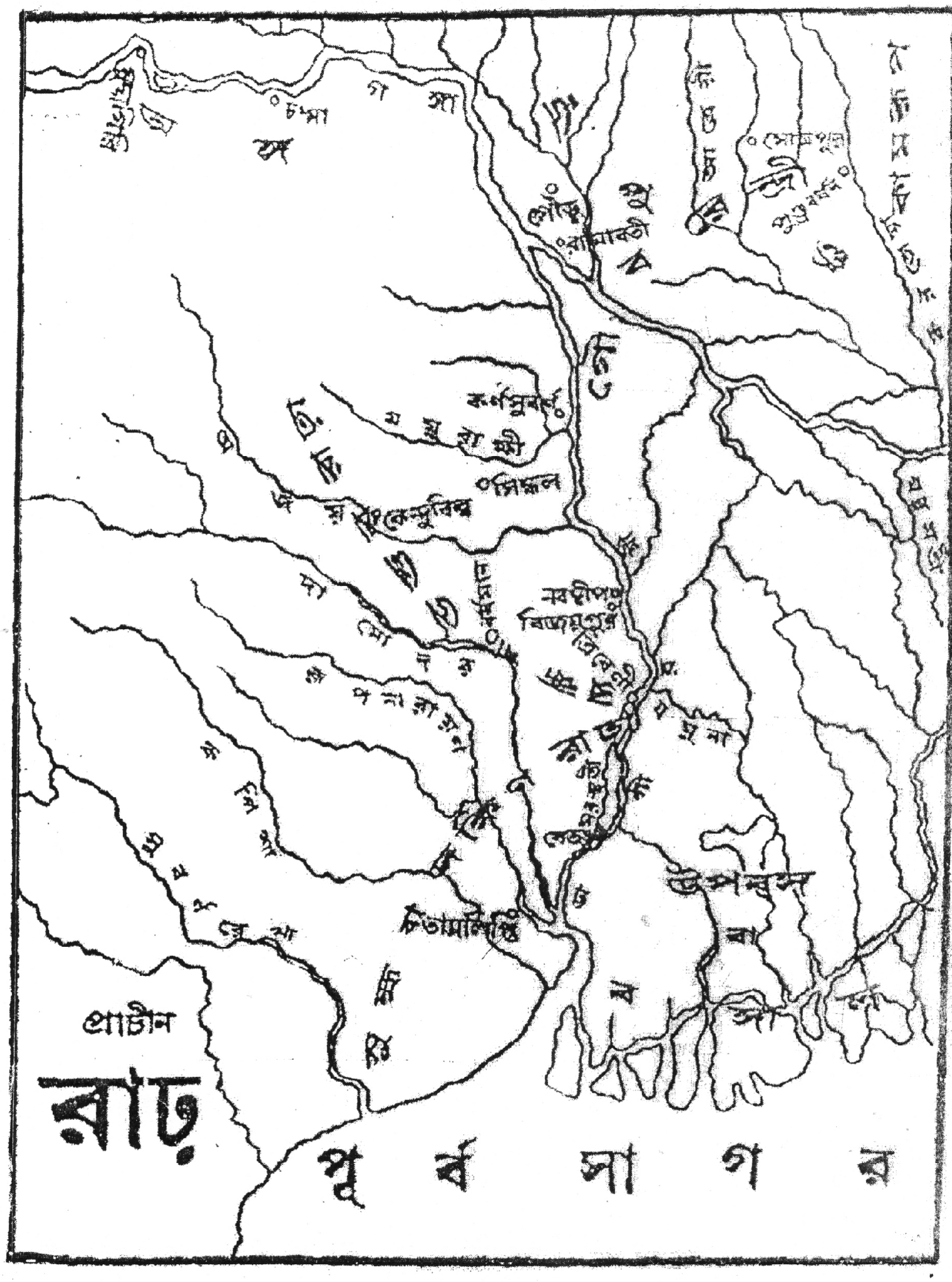

চিত্র সূত্র : নীহাররঞ্জন রায়, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব),

দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ, ১৪১০

অঞ্চলের উপর দিয়ে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে বিশেষত বর্ষাকালে অজয়, দামোদর, দ্বারকেশ্বর, শিলাবতী, কাঁসাই বা কংসাবতী, ময়ূরাক্ষী, ব্রাহ্মণী, কোপাই, রূপনারায়ণ, হুগলি, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীগুলি পশ্চিমাঞ্চল থেকে কাঁকুরে পলিমাটিসহ বিপুল জল বহন করে রাঢ় অঞ্চলে প্লাবন ঘটায়। ফলে বীরভূম, বর্ধমান, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলি জেলার বেশিরভাগ এলাকা, মুর্শিদাবাদ জেলার পশ্চিমাংশ ইত্যাদি অঞ্চল বর্ষাকালে প্লাবনে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

রাঢ় অঞ্চলের জলবায়ু চরমভাবাপন্ন। গ্রীষ্ম ও শীতকালে গড় তাপমাত্রা যথাক্রমে ৩০-৪০ ডিগ্রী সেলসিয়াস ও ১২-১৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে এই অঞ্চলে গড়ে প্রায় ১৪০-১৬০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলে এপ্রিল-মে মাসে কালবৈশাখী ও অক্টোবর মাসে আশ্বিনের ঝড় দেখা যায়। অরণ্যে পরিপূর্ণ এই অঞ্চলে প্রাকৃতিক উদ্ভিদের মধ্যে শাল, মহুয়া, কুল, জাম, বেত, বাঁশ ইত্যাদি গাছ ও বিভিন্ন প্রজাতির ঘাস পাওয়া যায়। বর্তমানে চোরা পথে বৃক্ষচ্ছেদনের ফলে সরকারি ব্যবস্থায় নতুন করে গাছ লাগানোর প্রকল্প শুরু হয়েছে, যাতে পরিবেশ রক্ষার সাথে মাটির ক্ষয়ও রক্ষিত হয়।

রাঢ়ের ঐতিহাসিক পরিচয়

রাঢ় অঞ্চল পূর্ব ভারতের একটি সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ভূমি বিন্যাস ও অধিবসতি এলাকা। সমগ্র রাঢ় অঞ্চলে আবিষ্কৃত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় প্রস্তর যুগ থেকে এ অঞ্চলে বিভিন্ন সময়ে বসবাসকারী মানব গোষ্ঠীর জীবনযাত্রা ও সংস্কৃতির পরিচয় পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের মানব সভ্যতার বিবর্তন ও ক্রমবিকাশের ধারায় সামিল থেকেছে। ধাতুর যুগ থেকে কৃষিভিত্তিক সমাজ গঠনের বিবর্তনে নগর সভ্যতা গড়ে উঠেছিল। এই সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ চন্দ্রকেতুগড়, তাম্রলিপ্ত, ভরতপুরের বৌদ্ধ স্তূপ ও মঙ্গলকোটে অধিবসতির প্রমাণ মিলেছে। সম্ভবত গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সময়ে বাংলাদেশ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। সেই সময় থেকেই বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে স্বতন্ত্র রাজ্য গড়ে ওঠে। খ্রিস্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে দক্ষিণ ও পূর্ববঙ্গে একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। তখন ছ'টি তাম্রশাসন থেকে এই রাজ্যের চারজন 'মহারাজাধিরাজ' উপাধিযুক্ত রাজার নাম পাওয়া যায়। তারা হল— ধর্মাদিত্য, গোপচন্দ্র, সমাচারদেব ও জয়নাগ। এদের অধীনে ছিল কর্ণসুবর্ণ (বর্তমানে মুর্শিদাবাদ জেলা)। এটাই তৎকালীন সময়ে বঙ্গরাজ্য নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে মহারাজা শশাঙ্ক গৌড়ের অধিপতি হয়। শশাঙ্কের পর অষ্টম শতাব্দীতে পাল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পাল রাজাগণকে গৌড়, বঙ্গ ও বঙ্গাল দেশের অধীশ্বর বলা হত। খ্রিস্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণ বাংলায় চন্দ্রদ্বীপ (বাখরগঞ্জ জেলায়) নামে একটি ছোট রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের তাম্রশাসনে লড়হচন্দ্র ও গোবিন্দচন্দ্র নামে দুই রাজা রাজত্ব করত। পরে সেনরাজাদের আমলে বঙ্গদেশ দুই ভাগে বিভক্ত হয়— বিক্রমপুরভাগ ও নাব্যভাগ। তবে "একাদশ শতাব্দীর লিপি সমূহেই আমরা প্রথম 'বঙ্গাল' দেশের উল্লেখ পাই। এই বঙ্গাল শব্দই মোগলযুগে বঙ্গদেশকে 'বঙ্গাল' নামে অভিহিত করতে সহায়তা করে।"[২]

১১৯৯-১২০২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে তুর্কী আক্রমণে লক্ষ্মণ সেনের পরাজয়ের পর সেন আমলের পতন ঘটে। মুসলমানরা বাঙলাদেশকে অধিকার করে নেয়। তখনও তারা নিজেদের গৌড়রাজ বলে অভিহিত করত। পরে ১৫৭৬ খ্রিস্টাব্দে মোগল সম্রাট আকবর সমগ্র বাঙলাদেশ অধিকার করলে গৌড়ের রাজনৈতিক সত্তা বিলুপ্ত হয়। ১৫৮২ খ্রিস্টাব্দে টোডরমল প্রণীত 'আসল-ই-জমা-তুমার' নামক রাজস্ব আদায়ের তালিকানুযায়ী বাঙলাদেশ ১৯টি সরকারে বিভক্ত ছিল। ১৭৫৭ খ্রিস্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অধীনে চলে যায় বাঙলা অঞ্চল। মোগলদের দেওয়া বঙ্গাল নামের অনুকরণে ইংরেজরা তখন বাঙলাদেশকে বলত 'বেঙ্গল' (Bengal), আর পোর্তুগীজরা বাঙলাদেশকে তখন 'বেঙ্গলা' (Bengala) বলত। এই বঙ্গদেশ বঙ্গভঙ্গ আইনে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে বিভক্ত হয়। আবার ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে পঞ্চম জর্জের নির্দেশে অবিভক্ত বঙ্গের আয়তন বাড়ে। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে ভারত স্বাধীন হলে পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গ নামে বাঙলা বিভক্ত হয়। পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 'এই রাঢ়ের উত্তর-পশ্চিমাংশে ছিল অঙ্গদেশ ও দক্ষিণে কলিঙ্গ।'[৩] এই রাঢ় দেশের আর এক নাম ছিল সুক্ষ্ম। ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীরবর্তী রাঢ় বা রাঢ়া দেশ— উত্তর ও দক্ষিণ রাঢ়া এই দুই নামে পরিচিত ছিল। অজয় নদী এই দুই বিভাগের সীমানা স্থল। 'কোন প্রাচীন গ্রন্থে গঙ্গার উত্তর ভাগও রাঢ়দেশের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া বর্ণিত। সাধারণত রাঢ়াদেশ গঙ্গার দক্ষিণ ও পশ্চিম ভাগেই সীমাবদ্ধ ছিল। রাঢ়ার অপর একটি নাম সুক্ষ্ম।'[৪]

ঐতিহাসিক, রাজনৈতিক ও শাসতন্ত্রের নিয়মে রাঢ় অঞ্চলের সীমানা কখনো সীমিত পরিমণ্ডলে আবার কখনো বিস্তীর্ণ এলাকায় পরিচিতি পেয়েছে। কখনো আবার জনপদের সাথে এই অঞ্চল যুক্ত হয়েছে। রাঢ়ের মূল ভূখন্ড ভাগীরথীর পশ্চিমভাগে অবস্থিত হলেও রাঢ় অঞ্চলের অধিবাসীরা জীবিকানির্বাহের প্রয়োজনে, পেশা, ব্যবসাসূত্রে, ভাষা ব্যবহারের ফলে কিংবা বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কারণে রাঢ়ের অঞ্চলের নির্দিষ্ট সীমানা ছাড়িয়ে রাঢ়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে চলেছে। সময়ের পরিবর্তনে বিভিন্ন সময়ে রাঢ়জনপদ ও তার অংশ বিশেষ ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিল। তার মধ্যে লাল, লাড়, রাঢ়, সুক্ষ্মভূমি, প্রসুক্ষ্ম, বজ্রভূমি, ব্রহ্ম, সুক্ষ্মোত্তর, কর্বাট, পানিতভূমি, তাম্রলিপ্ত, গৌড় ইত্যাদি স্থান নাম হল একই জনপদের সমার্থক বা রাঢ়জনপদ কেন্দ্রিক অংশ বিশেষ। রাজকীয় শাসনাবলীতে রাঢ়, সুক্ষ্ম ও বর্ধমান ভুক্তির উল্লেখ ব্যতীত দন্ডভূমি, দক্ষিণরাঢ়, উত্তররাঢ় মন্ডল, কঙ্কনগ্রামভুক্তি প্রভৃতি আঞ্চলিক নামের পরিচয় জানা যায়। এমনকি প্রাচীন গৌড়নগর, কর্ণসুবর্ণ, বর্ধমান, সপ্তগ্রাম, অপারমন্দার, রাঢ়াপুরী, ভূরীশ্রেষ্ঠী, নবদ্বীপ, কণ্টদ্বীপ ও কজঙ্গলের রাজপ্রাসাদ রাঢ়ের মধ্যেই অবস্থিত ছিল।

রাঢ়ের সাংস্কৃতিক পরিচয়

রাঢ় অঞ্চলের সমাজ ও সংস্কৃতির ধারা গড়ে উঠেছিল অস্ট্রিক, প্রাক-দ্রাবিড় ও অ্যাল্পাইন নরগোষ্ঠীর সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের ফলে। আরো পরে আর্য সংস্কৃতির প্রসার ও পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সেই ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারকে কেন্দ্র করে বাউরি, ডোম, বাগদি, মুচি, জেলে, ধোপা, গোপ, কোটাল, ময়রা, সাঁওতাল, কোল, মুন্ডা, লোধা, খেড়িয়া, শবর, ভূমিজ, মালপাহাড়ি প্রভৃতি উপজাতীয়

গোষ্ঠী আজও স্বাতন্ত্র্যবোধে নিজেদের বাঁচিয়ে রেখেছে। রাঢ় অঞ্চলের মানুষেরা নদীকেন্দ্রিক জীবিকা নির্বাহ করে। তাছাড়া কৃষিকাজ, পশুপালন ও শিকার করা ছিল প্রধান পেশা। বছরের বিভিন্ন সময়ে নদীপূজা, বৃক্ষপূজা, পশুপূজা, শিলাপূজা, স্থান বিশেষে গাজন, ভীমপূজা, চড়কমেলা দেখা যায়। পূজায় ব্যবহৃত হয় ধান, দূর্বা, হলুদ, কলাগাছ, আম্রপল্লব, ঘট ইত্যাদি। আবার অরণ্যসঙ্কুল প্রদেশে ও জলাভূমিতে বসবাসের কারণে মনসা, শীতলা, বাঘ, হাতি, কুমীর ইত্যাদি দেব-দেবী পূজিত হন। কৃষিকাজে ও গৃহকাজে ব্যবহৃত জিনিসগুলির মধ্যে লাঙ্গল, জোয়াল, দা, দড়ি, মই, ঝুড়ি, সরা, শঙ্খ, ঘটি, চাটাই, সুপারী, কলা, পান, মুড়ি, চেঙারি প্রভৃতি শব্দ আদিম মানব গোষ্ঠীর কাছে ব্যবহৃত হলেও সভ্য সমাজ ও সংস্কৃতিতে তা গৃহীত হয়েছে।

রাঢ়ের পূজা পদ্ধতি ও রীতিনীতিতে মহিষবলি, ছাগলবলি ইত্যাদি প্রথা অতি প্রাচীনকাল থেকে চলে এসেছে। রাঢ়ের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য স্থাপত্য ও ভাস্কর্যে পাওয়া যায়— অজস্র দেবালয়ে, মাজার, মসজিদ, সমাধি প্রাঙ্গণ, গীর্জা ইত্যাদি স্থানে বিভিন্ন ধর্মের ইতিহাস ও সংস্কৃতির ঐতিহ্য বহমান। যেমন— বর্ধমান জেলায় নির্মিত জৈন মন্দির, দাঁতনের মোগলমারীতে বৌদ্ধবিহার আজও রাঢ়ের প্রাচীন ঐতিহ্য।

রাঢ় অঞ্চলের মানুষেরা মূল বাংলা ভাষাকে সামনে রেখে রাঢ়ী উপভাষাসহ অন্যান্য উপভাষায় অল্পস্বল্প কথা বলেন। সংস্কৃতির সাথে সাহিত্যের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। বাংলা ভাষা প্রচারের ক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষায় রচিত পন্ডিতদের গ্রন্থগুলি বাংলা সাহিত্যের আদিরূপ হিসেবে ঐতিহ্যবাহী। কৃষ্ণ মিশ্র, জয়দেব, সর্বানন্দ, ধোয়ী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রভৃতি রাঢ়ীয় পন্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় পান্ডিত্য দেখিয়েছেন। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণব পদাবলীর কবিরা, মঙ্গলকাব্যের কবিরা মূলত বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে তুলেছেন। আরো পরে ভারতচন্দ্র, কমলাকান্ত ভট্টাচার্য, রামমোহন, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণদেব, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ, শরৎ চন্দ্র, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আমার গবেষণা কর্মে নির্বাচিত সাহিত্যিকগণও রাঢ় অঞ্চলের সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপকার।

সূত্রনির্দেশ

১. যজ্ঞেশ্বর চৌধুরী, রাঢ়ের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, নবদ্বীপ পুরাতত্ত্ব পরিষদ, ১ম সং, ২০০৮, পৃ.৩

২. অতুল সুর, বাঙলার সামাজিক ইতিহাস, জিজ্ঞাসা, ১ম সং, ১৯৮২, পৃ. ৩

৩. তদেব, পৃ. ১

৪. রমেশচন্দ্র মজুমদার, বাংলা দেশের ইতিহাস (প্রাচীন যুগ), জেনারেল, দশম সং, ২০০২, পৃ.৯